একটি সম্ভাব্য কথোপকথন

সোমেশ্বর ভৌমিক

[১৯৮৭ সালের প্রথমদিকে আমি মৃণাল সেন-এর একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আসলে চিদানন্দ দাশগুপ্তের কথামতো ফোন করেছিলাম অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একটি বিশেষ সংকলনের জন্য একটা ছোট সাক্ষাৎকার চেয়ে। কিন্তু বাড়িতে ডেকে মৃণালবাবু আমাকে বলেছিলেন, আমরা শুধু একটি বিষয়ে আটকে না থেকে আর-একটু ছড়িয়ে কথা বলব। বুঝলাম তাঁর হাতে তখন সময় আছে, কথা বলতে চাইছেন। এতে আমার তো না বলার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু তা বলে আমি ভাবিনি সেই 'আর-একটু ছড়িয়ে' কথাবার্তার দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে প্রায় ছ-ঘন্টায়। পরপর তিনদিন দু-ঘন্টা করে কথা বলেছিলেন মৃণালবাবু। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার ক্যাসেট ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর সব কথা তখনও শেষ হয়নি বলে নিজের দেরাজ থেকে ক্যাসেট বার করে দিয়েছেন। ইংরেজি-বাংলা মেশানো সেই কথোপকথনের পুরো পাঠটি ছাপা হয়েছিল 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায়, ১৯৮৭ সালের বার্ষিক সংখ্যায়।[১] ইংরেজিতে ছোটমাপের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল এ এস আই-এর বিশেষ সংকলনে[২]। এর পরে নিয়মমাফিক সাক্ষাৎকার বলতে যা বোঝায়, তার জন্যে আর বসা হয়নি আমাদের। কিন্তু যখনই গেছি তাঁর কাছে, অসংখ্য মণিমুক্তো আহরণ করে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছে সেসব লিখে ফেলেছি খাতায়। মাঝেমধ্যে আমার কোনও লেখা পড়ে নিজেই ফোন করে অনেক কিছু বলেছেন। লেখা আছে সেসব কথাও। এইভাবে তৈরি হয়েছে 'ব্যক্তিগত মৃণাল সেন' নামের এক একান্ত আপন সম্ভার।

'অনুষ্টুপ'-এরই পাতায় আমার লেখা সাদাত হাসান মান্টো আর মির্জা গালিব-এর এক কল্পিত কথোপকথন-ভিত্তিক লেখা[৩] পড়ে মজা পেয়েছিলেন মৃণালবাবু। ফোন করে অনেক কথা বলেছিলেন। সাদাত হাসান মান্টো তো ওঁরও প্রিয় লেখক। আজ আর-এক কথোপকথন তৈরির জন্য কথোপকথন পদ্ধতির সাহায্য নিলাম। তবে এবারে মৃণাল সেন নিজেই একজন চরিত্র। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী নিচের কথোপকথনের একটুও কল্পিত নয়। আমার সংলাপগুলো বিভিন্ন সময়ে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি ছবি বিষয়ে আমার কৌতূহলের নির্যাস। আর মৃণালবাবুর বয়ান তৈরির জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে তাঁরই প্রকাশিত লেখা আর সাক্ষাৎকারের অংশ, এবং আমার সেই 'ব্যক্তিগত মৃণাল সেন' সম্ভারের অংশবিশেষ। তাই নাম দিলাম 'সম্ভাব্য কথোপকথন'। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরই সামনে বসে শুনেছি তাঁর কথা। ছাপার অক্ষরে অনবদ্য সেই কথনভঙ্গির প্রতিরূপ তৈরি করা অসম্ভব। তবে তাঁর মতামতের ব্যাপারে চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব সতর্ক থাকার।]

সোমেশ্বর : মৃণালদা, আপনার সঙ্গে কথাবার্তায় বসেছিলাম প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল। সবে 'জেনেসিস' শেষ হয়েছে। আপনি ভাবছেন, কবিতার জায়গায় পৌঁছতে পারে ছবি, ছবিও কবিতার মর্যাদা পেতে পারে। আরও বলেছিলেন, এমন একটা সময় আসবে যখন হয়ত ছবি communicate করবে, only to yourself — personal cinema, personal level-এ। আমি হয়তো সেসব জায়গায় পৌঁছতে পারি, আমি জানি না। তবে আমি মনে করি, যদি এরকম কিছু করতে পারি, I will be happy — I wish I could do it.

মৃণাল সেন : খুব মনে পড়ছে, তুমি আসলে আমায় 'জেনেসিস'-এর abstraction নিয়ে প্রশ্ন করেছিলে, জিগেস করেছিলে available literary output নিয়ে আমি কি আর সন্তুষ্ট নই? তখন তো আমি সত্যিই একটু personal level-এ personal cinema-র কথা ভাবছিলাম। সেই ভাবনা থেকে করেওছিলাম দূরদর্শনের জন্যে 'কভি দূর কভি পাস' বলে একটা সিরিজ। খুব বেশি লোকের চোখে পড়েনি বোধ হয়।

সোমেশ্বর : আমার তা মনে হয় না।

মৃণাল সেন : কেন?

সোমেশ্বর : আসলে আপনার যে ইমেজটা আপনি 'কলকাতা '৭১' ছবিটা থেকে তৈরি করেছিলেন, দর্শক তার সঙ্গে এই সিরিজটাকে মেলাতে পারেনি।

মৃণাল সেন : অথচ দেখ, মিডিয়ামটা আলাদা। ফিল্মে আমি যেভাবে space-time manipulate করতে পারতাম, টেলিভিশনের limited visual scope-এ সেটা কখনোই করা সম্ভব ছিল না। আমাকে কাহিনির চরিত্রগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখাতে হয়েছে, যাতে তারা যে physical space-এ আছে সেটার ওপর নয়, ফোকাসটা থাকে তাদের mental space-এর ওপর। এই সিরিজে আমি কিন্তু available literary output-ই ব্যবহার করেছি। তবে medium-এর প্রয়োজনে আমায় চরিত্রগুলোর perception-এর ওপর বেশি জোর দিতে হয়েছে। আবার তার ঠিক আগেই 'জেনেসিস' করতে গিয়ে সমরেশ বসুর মূল গল্পের palpable physicality, যেখানে একজন নারীর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে দু'জন মানুষের কুস্তি লড়ার বিষয়টাকে আমার মনে হয়েছিল একটা Biblical perspective-এ বদলে নেওয়া যেতে পারে। আমি তখন ভাবছি ছবিতেও কবিতার মতো physical reality থেকে শুরু করে একটা concept-এ চলে যাওয়া যায়, আর আমার সেই ভাবনাকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে পারবে parable-এর abstraction।

সোমেশ্বর : আপনার শেষ দুটো ছবিকেও কি abstraction বলতে পারি না? যদিও সেখানে physical space visually অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তবু সেই space-এর ব্যবহারিক তাৎপর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সেই space চরিত্রগুলোর mental space-কে কতখানি accommodate আর reveal করতে পারছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মৃণাল সেন : এ-কথাটা ঠিকই বলেছ তুমি। এই ছবি দুটো আমার অন্যান্য ছবির চেয়ে অনেক বেশি personal space-নির্ভর। তাদের ভাল লাগা মন্দ লাগা জীবন সম্পর্কে তাদের বোধ আর উপলব্ধি এগুলোই দুটো ছবির মূল বিষয়, rather than what is happening around or with them. 'অন্তরীণ'-এ দেখবে অনেকটা সময় ধরে প্রায় কিছুই ঘটে না, শুধু

রাত্রিবেলায় টেলিফোনে কথা বলা ছাড়া। কিন্তু লক্ষ করতে হবে, টেলিফোনের একদিকে একজন লেখক, আর অন্যদিকে a lady with an oppressed soul. Both are very sensitive persons. So gradually the writer enters her mental space – and the lady on her part lays bare a world full of agony. অন্যদিকে 'আমার ভুবন' is much more happening. কিন্তু ঘটনাগুলো বারবার আমাদের টেনে নিয়ে যায় চরিত্রগুলোর অন্দরমহলে। সেখানে পৌঁছলে তুমি বুঝতে পারবে, মানুষগুলোর মধ্যে কোনও despair নেই, যা আছে তা হল আর-একটু ভালভাবে বাঁচার জন্যে desperation, desperation for a slightly better and more dignified living.

সোমেশ্বর : সেইজন্যেই 'আমার ভুবন'-এর শেষে সাউণ্ডট্র্যাকে গোলাবারুদের শব্দ শুনিয়েও আপনি লিখতে পারেন, ''পৃথিবী / ভাঙছে পুড়ছে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে / তবুও মানুষ বেঁচেবর্তে থাকে / মমত্বে / ভালবাসায় / সহমর্মিতায়।"

মৃণাল সেন : মনে করে দেখ, 'জেনেসিস' নিয়ে সেই আমিই সেন্ট ম্যাথু-র গস্পেল-এর ভাষা পালটে নিয়ে বলেছি, 'wretched are the poor and the meek for they shall not inherit the earth'। আবার, a world built or gained is but a world lost to be regained, to be rebuilt, Genesis over again. তাই এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনও বিরোধ নেই কিন্তু। They all represent the different phases of human civilization.

সোমেশ্বর : তার মানে, আপনার এই তিনটে ছবি এক তারে বাঁধা?

মৃণাল সেন : Of course, and they accentuate human resilience, in diverse forms.

সোমেশ্বর : কিন্তু বড় পরদার এই তিনটে ছবির মাঝখানে ছোট পরদার জন্যে যে ছবিগুলো করলেন — 'কভি দূর কভি পাস', সেগুলোতে তো ঠিক human resilience-এর ধাঁচে ফেলা যাচ্ছে না! সেগুলো অনেক low-key, প্রায় sublime.

মৃণাল সেন : তুমি 'তসবির আপনি আপনি'-র কথাও বল। ওটা দূরদর্শন-এর জন্যে আমার প্রথম ছবি। এর আগে মানিকবাবু ওদের জন্য করেছিলেন 'সদগতি'। তো ওরা আমাকেও ডাকল। এটা 'জেনেসিস' তৈরির আগে। আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না এর জন্য। কিন্তু পরে ভাবলাম, দেখিই না করে। সুনীল গাঙ্গুলির একটা গল্প নিয়ে ছবিটা করলাম। ছোট ক্যানভাসে, তিনটে মাত্র চরিত্র নিয়ে। তাদের একজন আবার লেখক। অন্য দুজন মালিক আর তার কর্মচারী। দুটো level-এ ছবিটা এগোয়। মালিক আর কর্মচারীর relationship-cum-dialectics-টা একটা level-এ, আবার আর একটা level-এ এদের দুজনের সঙ্গে conflict of interest তৈরি হয় লেখকের। এটা বিশেষ করে হয় কর্মচারী চরিত্রটির সঙ্গে কিন্তু মালিকও unaffected থাকে না। লেখকও না। এই লেখক কিন্তু 'অন্তরীণ'-এর লেখকের চেয়ে একদম আলাদা। এই ছবির লেখক একটা subject আর point-of-view আগে থেকেই তৈরি করে নিয়েছে, যেটা পরে questioned হচ্ছে। 'অন্তরীণ'-এ লেখকের subject-টাই evolve করছে আস্তে আস্তে through the intriguing telephonic conversation, point-of-view তো আরও পরের কথা। আর in course of time

সে-ও unaffected থাকে না।

সোমেশ্বর : তার মানে, বড় পরদার জন্যে তৈরি প্রথম ছবি 'রাতভোর' নিয়ে আপনার যে rejection বা denial সেটা ছোট পরদার জন্যে তৈরি প্রথম ছবি 'তসবির আপনি আপনি'-র ক্ষেত্রে নেই।

মৃণাল সেন : On the contrary, I believe I have done a fairly good job here.

সোমেশ্বর : আর সেইজন্যেই 'কভি দূর কভি পাস' করতে রাজি হওয়া।

মৃণাল সেন : হ্যাঁ, খানিকটা তাই। তবে 'কভি দূর কভি পাস'-এ আমি আমার focus-টা বদলে ফেলেছি। 'তসবির আপনি আপনি'-তে I was exploring a new medium, but my intention was to disturb the audience. কিন্তু এই সিরিজ-এ আমি ভেবেছি personal level-এ personal cinema-র কথা।

সোমেশ্বর : এখানে আমি একটু আপনাকে থামাব। 'কভি দূর কভি পাস'-কে আপনি বললেন 'সিরিজ'। কিন্তু স্ক্রীন-এ লেখা আছে A Serial by Mrinal Sen. 'কভি দূর কভি পাস'-কে তো কোনোমতেই সিরিয়াল বলা যায় না। আপনি তো ধারাবাহিকভাবে একটাই বিষয়কে তার নানা দিক থেকে খুলে দেখাচ্ছেন না। আপনি তৈরি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি-নির্ভর ১২টা টেলিফিল্ম। খুব আলগাভাবে একটা বিষয় সেখানেও খুঁজে পাওয়া যায়; মানুষে মানুষে সম্পর্ক। কিন্তু এক পর্বের সঙ্গে আর-এক পর্বের কোনও যোগ সেখানে নেই। প্রতিটি পর্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আজকের লঙ্জে 'কভি দূর কভি পাস' একটা 'অ্যান্থোলজি সিরিজ'। এর পেছনের ভাবনাটার কথা যদি বলেন।

মৃণাল সেন : আবার তোমার শুরুর কথাতে ফিরে যাই। তুমি জিগেস করেছিলে available literary output নিয়ে আমি কি আর সন্তুষ্ট নই! তখন এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বিশদে কিছু বলিনি। কারণ, তখনও পুরোটা মাথায় আসেনি। এখন বলছি, এই সিরিজটা করতে গিয়ে আমি নিজেই নিজের দিকে কয়েকটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। একটা তো অবশ্যই personal level-এ personal cinema তৈরি করা, যেটা আমি আগে কোনোদিন করিনি। আর-একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, to be able to communicate to a completely different audience, different in their viewing habits, different in their perceptions, maybe somewhat different in their demographic profiles. In effect I was addressing a totally different milieu. তাছাড়া টেলিভিশনের limited visual space without any depth of field-টাও মাথায় রাখতে হয়েছে। It was a challenging task, both technologically and aesthetically. ফলে বুঝেছিলাম, আমাকে কাজ করতে হবে অনেক আঁটঘাট বেঁধে। সেটা করতে গিয়ে I had to fall back on available literary output, but with a rider. আমাকে খুঁজে বার করতে হয়েছে এমন কিছু গল্প যা হয়ত কুড়ি-তিরিশ বছরের পুরনো, কিন্তু পৌঁছতে পারে একালের মনস্তত্ত্বের কাছাকাছি। গল্পগুলোকে সাজাতে হয়েছে, বলতে হয়েছে এমনভাবে যাতে সেগুলো আজকের মানুষকে আজকের কথা মনে করিয়ে দিতে পারবে, আজকের

কথা ভাবিয়ে তুলবে, আজকের বস্তুজগতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে। সিনেমায় এমন প্রায়ই দেখা যায় যেখানে আধুনিক জীবনের সমস্ত উপকরণই আছে, অথচ এই সমস্ত থেকেও গোটা ব্যাপারটা কেমন যেন সেকেলেই থেকে যায়। আমি চেয়েছিলাম কাহিনিতে আর কাহিনির চরিত্রগুলোর মধ্যে একালের হাওয়া বইয়ে দিতে, একালের মনস্তত্ত্বে ব্যাখ্যা করতে, সবকিছু একালের ঢং-এ বিশ্লেষণ করতে। তাহলেই সেগুলো একালের কাহিনি হয়ে উঠবে। তবে হয়ত এই কারণেই ছবিগুলো গড়পড়তা টেলিভিশন দর্শকের কাছে সেভাবে গ্রহণযোগ্য হল না।

তুমি বলছিলে নিজের যে ইমেজটা আমি 'কলকাতা '৭১' ছবিটা থেকে তৈরি করেছিলাম, দর্শক তার সঙ্গে এই সিরিজটাকে মেলাতে পারেনি। কিন্তু তারপর 'একদিন প্রতিদিন', 'খারিজ' বা 'খণ্ডহর'-ও তো করেছি। 'কভি দূর কভি পাস' কি এদের চেয়ে অনেক আলাদা?

সোমেশ্বর : সেইজন্যেই আপনি আর ফিরে যাননি টেলিভিশনের পরদায়? অভিমানে?

মৃণাল সেন : এটা অভিমান নয়। একদম বাস্তব উপলব্ধি। ছবি করার সময়েই আমি ধরে নিই যে দর্শকের সমস্যা থাকবেই, অর্থাৎ সব দর্শকের আমার ছবি ভাল লাগবে না। অনেকেই প্রচণ্ডভাবে reject করবেন। কিন্তু এই reject করতে বা গ্রহণ করতে, শিল্পসম্মত কায়দায় reject করতে বা শিল্পসম্মত কায়দায় গ্রহণ করতে, আমার একটা discriminating audience প্রয়োজন হবে। তার জন্যে climate তৈরি করতে হবে, আর দর্শকও তৈরি করতে হবে। এটা একদিনের কাজ নয়। মানিকবাবু বা আমি টেলিভিশনের জন্যে একটা-দুটো ছবি করলেই সেই climate বা discriminating audience তৈরি হবে না। আমি বহুদিনের চেষ্টায় যেভাবে system-কে manipulate আর subvert করে নিজের একটা audience base তৈরি করেছি, সেই কায়দাগুলো টেলিভিশনের জগতে খাটত না। তার জন্যে অন্য পথ নিতে হত। সেই mind-set বা সময়টা আমার আর ছিল না।

সোমেশ্বর : বুঝলাম। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে, নিজের টেলিফিল্ম নিয়ে প্রায় কোনও কথাই আপনি বলেননি। সেটা কি রলাঁ বার্ত-এর 'death of the author' তত্ত্বের প্রভাবে — কাজ শেষ হলেই স্রষ্টা চলে যাবেন আড়ালে, তখন ব্যাখ্যার যাবতীয় দায় গ্রহীতার?

মৃণাল সেন : না না, কখনোই এভাবে ভাবি না আমি। আমার কাজের যাবতীয় দায় আমার। কোনও ছবি আমার নিজের ভাল লাগে, কোনও ছবি লাগে না, কোনও ছবি মোটামুটি tolerable মনে হয়, আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, সব কিছু ছেড়েছুড়ে if I could start filmmaking from a zero point. তবে হ্বাগনারের মতো আমিও বিশ্বাস করি, কখনও কখনও when you create you must not explain, explanation comes later. আমি সেটাকে একটু বাড়িয়েও বলতে পারি যে, perhaps these explanations will not always come from the creator.

সোমেশ্বর : এই হ্বাগনার তো সংগীতকার রিচার্ড হ্বাগনার নন, ক্রিস্টোফার মারলো-র নাটক 'ড: ফস্টাস'-এর এক চরিত্র?

মৃণাল সেন : হ্যাঁ, যে ড: ফস্টাস-এর ছাত্র হিসেবে গুরুকে এই বলে সাবধান করে দেয় যে সব বিদ্যার গোপন রহস্য ছাত্রদের কাছে ফাঁস করার দরকার নেই, তারা যতই প্রতিভাবান হোক।

সোমেশ্বর : আপনাকে কোন হ্বাগনার সাবধান করে দিয়েছিল?

মৃণাল সেন : কেউ না। এটা আমি নিজেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, টেলিফিল্মের মধ্যে সিনেমার মতো এমন কিছু রহস্য বা গভীরতা থাকতে পারে না যে তার ব্যাখ্যা দরকার। টেলিফিল্মকে আমি ছোট করছি না, সেই মাধ্যমেও নিশ্চয় অনেক কিছু করা সম্ভব। তবে আমার sensitivity থেকে যে রহস্য বা গভীরতার সন্ধান আমি পেতে চাই শিল্পের মধ্যে, তার জন্যে ফিল্মই appropriate, টেলিফিল্ম নয়।

সোমেশ্বর : আমার কিন্তু মনে হয়েছে আপনার টেলিফিল্মের মেজাজ কিছুটা হলেও ছায়া ফেলেছে আপনার শেষ তিনটে ছবিতে, যেগুলো বড় পরদার জন্যেই করা।

মৃণাল সেন : তুমি বলতে পার। টেলিভিশনের জন্য কাজ করতে গিয়েই আমি মানুষের private বা intimate space-টাকে আরো ভালভাবে explore করতে পেরেছি, সেসব নিশ্চয়ই বড় পরদার জন্যে ছবি করতে গিয়ে at the back of my mind-এ ছিল।

সোমেশ্বর : আমাদের এই আলাপ শেষ করার আগে একবার শুরুর কথাগুলোয় ফিরে যাই। আপনি নিজের জীবনেই এমন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন যখন personal level-এ personal cinema দিয়ে you will communicate only to yourself. এই ছবিগুলোকে কি আপনি সেই পর্যায়ে ফেলবেন?

মৃণাল সেন : কোন ছবিগুলোকে?

সোমেশ্বর : 'জেনেসিস', 'অন্তরীণ' আর 'আমার ভুবন'।

মৃণাল সেন : কেউ যদি সেভাবে দেখেন আমি আপত্তি করব না। কিন্তু একই সঙ্গে এই ছবিগুলোর মূল সুরটাও আর একবার মনে করিয়ে দেব — they accentuate human resilience, in diverse forms.

সোমেশ্বর : তার মানে even when you are communicating only to yourself you remain involved with the humankind?

মৃণাল সেন : নিশ্চয়ই, আমি মনে করি শিল্পের জগতে communication-ই বড় কথা আর communicate করতে গেলে you have to get involved. মানুষের সঙ্গে ছাড়া সেই involvement-এর আর কোনও ভাল উপায় আমার অন্তত জানা নেই।

তথ্যসূত্র :

১। ''মৃণাল সেন ১৯৮৭", *অনুষ্টুপ* বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৬২;৪৯২।

২। "Man in my Films"– Mrinal Sen/Someswar Bhowmik, *A Portrayal of People : Essays on Visual Anthropology in India*, New Delhi : ASI-INTACH, 1987, pp. 161-168।

৩। ''মির্জা গালিবের কৈফিয়ত", *অনুষ্টুপ* বার্ষিক সংখ্যা, ২০১৪, পৃ. ২৮৬-৩০০।

সোমেশ্বর ভৌমিক : দৃশ্যকলা গবেষক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।